কৃষিই সমৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ সিডিউল ও প্রশিক্ষণ বার্তা

মার্চ /২০২৩

উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়

বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০১

তারিখঃ ০৭ মার্চ, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রুপরেখা

সময়	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০.০০-১১.০০	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।	এইও/ এএইও/ এসএপিপিও
১১.০০-১১.৩০	বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যর নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা।	ইউএও/ এইও
১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস	আই পি এম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও এর উপাদানসমূহ	ইউএও
১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস	ফসলের বানিজ্যিক উৎপাদনে বালাইনাশকের ব্যবহার ও করণীয়	এইও
১.০০-২.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	
২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস	ধানের গল মাছি পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
২.৩০- ৩.০০ চতুর্থ ক্লাস	গমের ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস	ধানের আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা	এইও

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০২

তারিখঃ ২১ মার্চ, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রুপরেখা

সময়	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০.০০-১১.০০	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।	এইও/ এএইও/ এসএপিপিও
১১.০০-১১.৩০	বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যর নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা।	ইউএও/ এইও
১১.৩০-১২.০০ প্রথম ক্লাস	ধানের ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
১২.০০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস	কুমড়া জাতীয় ফসলের মোজাইক রোগ দমন ব্যবস্থাপনা	ইউএও
১.০০-২.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	
২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস	মিষ্টি কুমড়ার ব্লোজম এন্ড রট রোগের দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
২.৩০-৩.০০ চতুর্থ ক্লাস	মাটি পরীক্ষার জন্য মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি	এইও
৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস	এসডিজি ও কৃষি	এইও

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আই পি এম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও এর উপাদানসমূহ

আইপিএম বা **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা** বলতে পরিবেশকে দুষণমুক্ত রেখে প্রয়োজনে এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ বালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে রাখাকে বুঝায়, যাতে করে পরিবেশ দূষিত না হয়। উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ, বালাই সহনশীল জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বালাইনাশকের সময়োচিত ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারকে নিশ্চিত করে।

আইপিএম এর পাঁচটি উপাদান

১. জৈবিক দমনে ব্যাঙ, চিল, পেঁচা, গুইসাপ, মাকড়সা, লেডী বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, বোলতা, মিরিড বাগ, ওয়াটার বাগ, ড্যামসেল ফড়িং প্রভৃতি উপকারী পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিকারক পোকা দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে।
২. উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য:

- ধান ক্ষেতের আইলে শিম ও শসা জাতীয় ফসল আবাদ করা।
- জমিতে পরিমিত পরিমাণ পানি রাখা।
- ফসল কাটার অন্তত: ৪/৫ ঘণ্টা পর জমিতে লাঙল দেওয়া।
- ফসল কাটার পর আইলে কিছু খরকুটা বিছিয়ে দেওয়া।
- জমিতে বাঁশের বুষ্টার স্থাপনের মাধ্যমে বোলতা প্রতিপালন করা।
- বালাইনাশকের এলোপাতাড়ি ব্যবহার পরিহার করা।

বালাই সহনশীল জাতের চাষাবাদ

ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ অনেকাংশে রোধ করতে পারে। যেমন-

- বি আর ২৬: সাদা-পিঠ গাছ ফড়িং ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল এবং পাতাপোড়া রোগ, বাদামি গাছ ফড়িং সবুজ পাতা ফড়িং আক্রমণে মধ্যম প্রতিরোধশীল।
- বাদামী গাছ ফড়িং ও সবুজ পাত ফড়িং আক্রমণে মধ্যম প্রতিরোধশীল ।
- ব্রি ধান ২৭: সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর আক্রমণে প্রতিরোধশীল।
- টুংরো, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া রোগ এবং বাদামি গাছ ফড়িং ও পামরী পোকার আক্রমণে মধ্যম প্রতিরোধশীল।
- ব্রি ধান ৩১: বাদামি গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণে প্রতিরোধশীল এবং পাতা পোড়া ও টুংরো রোগে মধ্যম প্রতিরোধশীল ।
- ব্রি ধান ৩৫: বাদামি গাছ ফড়িং প্রতিরোধশীল এবং টুংরো রোগ মধ্যম প্রতিরোধশীল ।

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার

সুস্থ বীজ, সঠিক দূরত্বে রোপন, সবল চারা, সুষম সার, আগাছা মুক্ত জমি, সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা, সারিতে রোপণ ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি

- হাত জালের সাহায্যে পোকা ধরে মারা।
- আলোর ফাঁদে পোকা ধরা।
- আক্রান্ত পাতার আগা কেটে দেওয়া।
- পাখি বসার জন্য ডাল পুঁতা।
- হাত দিয়ে পোকার ডিম সংগ্রহ করে ধংশ করা।
- এসব পদ্ধতি ব্যবহারে বালাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থা

- নিয়মিতভাবে অপকারী ও উপকারী পোকামাকড়ের উপস্থিতি জরিপ করা।
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কেবল আক্রান্ত জমিতে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়, সঠিক মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা।

প্রথম ৪টি উপাদানের সাহায্যে ও যদি ক্ষতিকারক পোকা- মাকড় ও রোগের আক্রমণ দমিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, কেবল তখনই সর অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তে (ইটিএল) পৌঁছে গেলে তখনই বালাইনাশক সঠিকভাবে ব্যবহার করা দরকার।

ফসলের বানিজ্যিক উৎপাদনে বালাইনাশকের ব্যবহার ও করণীয়

ফসলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে নতুন কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন বালাইনাশকের পরিকল্পিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে। আবহাওয়াগত কারণে ও জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চাষিদের। এর মধ্যে রোগ ও পোকামাকড়ের সমস্যা অন্যতম। আর এ কাজে সহযোগিতা করছেন দেশের অনেক বালাইনাশক কোম্পানি। তাদের লক্ষ্য হলো কৃষকের পাশে থেকে তাদের ফসল উৎপাদনে রোগবালাই দমনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং দেশের কৃষি উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা। তবে বর্তমান সময়ে ফল-ফসলে বালাইনাশকের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ ম-লের আবহাওয়া বিরাজমান এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে রোগবালাই তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে। উচ্চ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিকাংশ ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগের জীবাণুর প্রজনন ও বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে ফসল উৎপাদনে প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা। ফল-ফসলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে এগুলোর দমন অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি হয়ে পড়ে। আর এর দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আমাদের চাষিরা। প্রায় সব ফল-ফসলে বালাইনাশকের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্প্রের মূলনীতি

স্প্রের সুফল পেতে হলে যে কোনো বালাইনাশক স্প্রে করতে ৪টি মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলা উচিত। এগুলো হলো সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন, সঠিক ডোজ বা মাত্রা নির্ধারণ, সঠিক সময় নির্বাচন এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ।

সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন

আমের রোগ বা ক্ষতিকর পোকা লাভজনকভাবে ও কম খরচে দমন করতে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করা একটি অতীব গুরুত্বর্পূর্ণ পদক্ষেপ। ওষুধ নির্বাচনে কোনো ভুল হয়ে থাকলে স্প্রে কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে যায়। এতে শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে উপরন্তু আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। অনেক কৃষক কীটনাশক ডিলারদের জিজ্ঞাসা করেন কি ওষুধ স্প্রে করতে হবে, এটা মোটেই ঠিক নয়। এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষিকর্মী, কৃষি কর্মকর্তা অথবা আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে (আম গবেষণা কেন্দ্রে) যোগাযোগ করা উচিত। একই কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক বার বার স্প্রে না করে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা উচিত। কারণ একই ওষুধ বার বার স্প্রে করলে পোকা বা রোগের জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।

সঠিক মাত্রা নির্ধারণ

সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। বালাইনাশকের মাত্রা কম বা বেশি না হওয়ায় উত্তম। উপযুক্ত মাত্রা না হলে রোগ বা পোকামাকড় ভালোভাবে দমন করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু রোগের জীবাণু বা পোকার মধ্যে বালাইনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। আবার অধিক মাত্রায় বালাইনাশকের ব্যবহার অর্থের অপচয় হয় এবং ফলগাছের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই বালাইনাশকের মাত্রার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লিখিত নির্দেশনা, কৃষি বিজ্ঞানীদের, কৃষি কর্মকর্তা এবং কৃষিকর্মীর পরামর্শমতো কাজ করা উচিত।

সঠিক সময় নির্বাচন

কথায় বলে, সময়ের এক ফোড় অসময়ের দশ ফোড়। এ কথা সত্য যেকোনো কাজ সঠিক সময়ে সমাধা করতে পারলে বাড়তি শ্রম ও বাড়তি খরচের অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমগাছে মুকুল আসার পর থেকে ফলধারণ পর্যন্ত সময়টুকু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে রোগ বা পোকার আক্রমণ হলে গাফিলতি করা মোটেই ঠিক নয়। এ সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে আমগাছে ফলধারণ নাও হতে পারে। আমগাছে মুকুল আসার ১৫-২০ দিন আগে প্রথমবার, আমের মুকুল ১০-১২ সেমি. হলেই দ্বিতীয়বার এবং আম মটরের দানার সমান হলে তৃতীয়বার স্প্রে করা উচিত। মুকুলের ফুল ফোটার

পর কোনো অবস্থাতেই স্প্রে করা যাবে না। আমের পরাগায়ন প্রধানত বিভিন্ন প্রজাতির মাছি ও মৌমাছি দ্বারা হয়ে থাকে। তাই ফুল ফোটার সময় কীটনাশক স্প্রে করলে মাছি মারা যেতে পারে এবং আমের পরাগায়ন ও ফলধারণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। গাছ থেকে ফল পাড়ার ১৫-২০ দিন আগ থেকে গাছে কোনো বালাইনাশক স্প্রে করা উচিত নয়। গাছে মুকুল বের হওয়ার আগেই অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে প্রয়োজনীয় অর্থ, শ্রমিক, স্প্রে যন্ত্রপাতি, ওষুধ ইত্যাদি মজুদ রাখতে হবে।

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ

সঠিক ওষুধ, সঠিক মাত্রা, সঠিক সময় ইত্যাদি নির্ধারণের পর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। স্প্রে কার্যক্রম থেকে পরিপূর্ণ ফল লাভ করতে হলে অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে স্প্রে করতে হবে। ফলের মধ্যে বা ডালের মধ্যে ছিদ্রকারী পোকা অবস্থান করলে বাইরে কীটনাশক স্প্রে করলে কোনো লাভ হয় না। আমের হপার পোকা সুষ্ঠুভাবে দমন করতে হলে পাতায় স্প্রে করার সাথে সাথে গাছের গুঁড়িতেও স্প্রে করা প্রয়োজন। তাই সুষ্ঠুভাবে রোগ বা পোকা দমনের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস বা আম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের সাথে আলাপ করে পরামর্শ নেয়া উচিত।

স্প্রে করার সময়ে সতর্কতা

যিনি স্প্রে করবেন তার যেন স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হয় সেইদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। এ্যাপ্রোন, মাস্ক, চোখে চশমা, মাথায় হেলমেট বা গামছা দ্বারা আবৃত করে ¯েপ্র করা উচিত। স্প্রে করার সময় কোনো কিছু না খাওয়ায় উত্তম। প্রখর সূর্যালোকে স্প্রে না করাই ভালো। স্প্রে কার শেষ হলে পরিষ্কার পানিতে হাত, মুখসহ অন্যান্য অংশগুলো ভালভাবে সাবান দিয়ে ধৌত করতে হবে। সম্ভব হলে গোসল করা উত্তম।

ধানের গল মাছি পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

পরিচিতি:

১. পূর্ণবয়স্ক গলমাছি দেখতে একটা মশার মত। স্ত্রী গলমাছির পেটটা উজ্জ্বল লাল রঙের হয়।

২.এরা রাতে আলোতে আসে, কিন্তু দিনের বেলায় বের হয় না। স্ত্রী গলমাছি সাধারণত পাতার নিচের পাশে ডিম পাড়ে। তবে মাঝে-মাঝে পাতার
খোলের উপরও ডিম পাড়ে।

৩.ধানের উপরে গলমাছির জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে ৯ থেকে ২৪ দিন সময় লাগে।

৪.ধানের চারা অবস্থা থেকে যদি আক্রমণ শুরু হয় তাহলে কাইচ থোড় অবস্থা আসা পর্যন্ত সময়ে এ পোকা কয়েকবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারে।

ক্ষতির ধরণ:

গাছের মাঝখানের পাতাটা গল বা পিঁয়াজ পাতার মত হয়ে যায়। তারই গোড়ায় বসে গলমাছির কীড়াগুলো খায়। কীড়াগুলো এই গলের মধ্যেই পুত্তলীতে পরিণত হয় এবং এই গলের একেবারে ওপরে ছিদ্র করে পুত্তলী থেকে পূর্ণ বয়স্ক গলমাছি বেরিয়ে আসে। শুধু পুত্তলীর কোষটা সেখানে লেগে থাকে।

পূর্ণ বয়স্ক গলমাছি দেখতে একটা মশার মত। স্ত্রী গলমাছির পেটটা উজ্জল লাল রঙের হয়। এরা রাতে আলোতে আসে, কিন্তু দিনের বেলায় বের হয় না। স্ত্রী গলমাছি সাধারণতঃ পাতার নীচের পাশে ডিম পাড়ে, তবে মাঝে মধ্যে পাতার খোলের উপরও ডিম পাড়ে।

যে সমস্ত অঞ্চলে শুধু শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুম বিদ্যমান, সে সব অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমের আগাম ধান ক্ষতি এড়িয়ে যেতে পারে। বর্ষা মৌসুমের শেষের দিকে রোপণ করলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বর্ষা মৌসুমে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকলে শুষ্ক মৌসুমে সেচের আওতাভুক্ত ধানক্ষেত আক্রান্ত হতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আলোক ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক গলমাছি ধরে ধ্বংস করা।

২.শতকরা ৫ ভাগ পিঁয়াজ পাতার মতো হয়ে গেলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা।

গমের ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনা

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম *ম্যাগনাপরথি অরাইজি (পাইরিকুলারিয়া অরাইজি)* প্যাথোটাইপ ট্রিটিকাম। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

গমের ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লাস্ট আক্রান্ত গম ক্ষেতের কোনো কোনো স্থানে শীষ সাদা হয়ে যায় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা অতি দ্রুত সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে। গমের কিছু শীষের উপরিভাগ শুকিয়ে সাদাটে বর্ণ ধারণ করে যা সহজেই নিম্নভাগের সবুজ ও সুস্থ অংশ থেকে আলাদা করা যায়; আবার কোনো কোনো শীষের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই শুকিয়ে সাদাটে হয়ে যায়। এটি গমের ব্লাস্ট রোগের আদর্শ (Typical) লক্ষণ। প্রধানত গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। শীষের আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ সাদা হয়ে যায়। তবে শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে পুরো শীষ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। আক্রান্ত শীষের দানা অপুষ্ট হয় ও কুঁচকে যায় এবং দানা ধূসর বর্ণের হয়ে যায়। পাতায়ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে পাতায় চোখের মতো ধূসর বর্ণের ছোট ছোট নেক্রোটিক দাগ পড়ে।

রোগের বিস্তার

আক্রান্ত বীজ এবং বাতাসের মাধ্যমে গমের ব্লাস্ট রোগ ছড়ায়। বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ভেজা থাকলে এবং তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা এর বেশি হলে এ রোগের সংক্রমণ হয় এবং রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ব্লাস্ট রোগের জীবাণু কিছু ঘাস জাতীয় বিকল্প পোষক আগাছার যেমন- চাপড়া, শ্যামা, আংগুলি ঘাসের মধ্যে বাস করতে পারে; তবে সেখানে রোগের স্পষ্ট লক্ষণ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনুকূল পরিবেশে বিকল্প পোষক আগাছায় ব্যাপকভাবে উৎপন্ন জীবাণু ব্লাস্ট রোগের মহামারী সৃষ্টি করতে পারে।

গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

ব্লাস্টমুক্ত গমের ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে; অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল জাত বারি গম ২৮, বারি গম ৩০ এর চাষ করতে হবে; উপযুক্ত সময়ে (অগ্রহায়ণের ০১ থেকে ১৫) বীজ বপন করতে হবে যাতে শীষ বের হওয়ার সময় বৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা পরিহার করা যায়; বপনের আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি অথবা ৩ মিলি হারে ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে গমের অন্যান্য বীজবাহিত রোগও দমন হবে এবং ফলন বৃদ্ধি; গমের ক্ষেত ও আইল আগাছামুক্ত করতে হবে। প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২ থেকে ১৫ দিন পর আরেকবার ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি-নভিটা ৭৫ ডব্লিউ জি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করলে গমের পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ দমন হবে। ছত্রাকনাশক ব্যবহারের সময় হাতে গ্লোভস এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে যাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের সংস্পর্শে না আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

ধানের আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা

ধান চাষে পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানো যায় এবং সঠিক পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণের মাধ্যমে ধানের ফলনের ক্ষতি এড়ানো যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কেবল আমন মৌসুমেই সম্পূরক সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে খরা মোকাবেলা করে দশ লাখ টন বাড়তি ধান উৎপাদন করা সম্ভব।

এডব্লিউডি পদ্ধতি

বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানি সাশ্রয়ী আর একটি পদ্ধতির নাম অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রায়িং (পর্যায়ক্রমে ভেজানো-শুকানো) বা এডব্লিউডি। এ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় একটি ৭-১০ সেন্টিমিটার ব্যাস ও ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ছিদ্রযুক্ত পিভিসি পাইপ বা চোঙ্গা। পাইপটির নিচের দিকের ১৫

সেন্টিমিটার জুড়ে ছোট-ছোট ছিদ্র থাকে। এটি চারা রোপণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে জমিতে আইলের কাছে চারটি ধানের গোছার মাঝে খাঁড়াভাবে স্থাপন করতে হবে যেন এর ছিদ্রবিহীন ১০ সেন্টিমিটার মাটির উপরে এবং ছিদ্রযুক্ত ১৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে থাকে। এবার পাইপের তলা পর্যন্ত ভিতর থেকে মাটি উঠিয়ে নিতে হবে। মাটি শক্ত হলে গর্ত করে পাইপটি মাটিতে বসানো যেতে পারে। যখন পানির স্তর পাইপের তলায় নেমে যাবে তখন জমিতে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন দাঁড়ানো পানির পরিমাণ ৫-৭ সেন্টিমিটার হয়। আবার ক্ষেতের দাঁড়ানো পানি শুকিয়ে পাইপের তলায় নেমে গেলে পুনরায় সেচ দিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ চলবে জাতভেদে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত। যখনই গাছে থোড় দেখা দেবে তখন থেকে দানা শক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষেতে স্বাভাবিক ২-৫ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে। দেখা গেছে, এডব্লিউডি পদ্ধতিতে বোরো ধানে সেচ দিলে দাঁড়ানো পানি রাখার চেয়ে ৪-৫টি সেচ কম লাগে এবং ফলনও কমে না। ফলে সেচের পানি, জ্বালানি ও সময় সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচও হ্রাস পায়। তবে এ পদ্ধতি প্রয়োগের একটি নেতিবাচক দিক হলো, এর ফলে সেচ ব্যবস্থা অনুসরণ করলে ব্লাস্ট রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।

শস্যবিন্যাসের মাধ্যমে খরা মোকাবেলা

ব্রির সেচ ও পানি ব্যবস্থপনা বিভাগ শস্যবিন্যাসে সামান্য পরিবর্তন এনে দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা মোকাবেলার একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বোরো ও আউশের মধ্যবর্তী সময়ে ধান রোপণ করা হলে সেটিকে ব্রাউশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বোরোর জাত ব্রাউশে আবাদ করা হলে জীবনকাল কিছুটা কমে। পক্ষান্তরে আউশের জাত ব্রাউশে আবাদ করা হলে জীবনকাল কিছুটা বাড়ে। দীর্ঘ জীবনকালের জাত দিয়ে বোরো-পতিত-আমন শস্যক্রমের পরিবর্তে স্বল্প জীবনকালের আউশ-আমনের জাত দিয়ে আলু-ব্রাউশ-আমন শস্যক্রম অনুসরণ করলে সেচের পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্বল্প জীবনকালের ধানের জাত যেমন- ব্রি ধান২৮ বা ব্রি ধান৪৮ ব্রাউশে রবি শস্য আবাদের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্রাউশ মৌসুমে ব্রি ধান৪৮ তুলনামূলকভাবে ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে বেশি ফলন দেয়। রবি শস্য হিসেবে বারি আলু-৭ বা বারি আলু-২৫ আবাদ করা যেতে পারে। এ প্রযুক্তির (আলু-ব্রাউশ-আমন) ধান-সমতুল্য ফলন (১৮ টন/হেক্টর) আমন-বোরো-পতিত শস্যক্রমের (১২.৩ টন/হেক্টর) তুলনায় অধিক এবং এটি শতকরা ৩২ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় করে। এ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সেচের খরচ কমাবে এবং সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমাবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্রাউশ ধান স্বাভাবিক বোরোর মতোই ফলন দেয়। প্রযুক্তিটি রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে কৃষকের মাঠে পরীক্ষা করে ভালো ফল পাওয়া গেছে।

প্রযুক্তির সুবিধা

-বৃষ্টির পানি অধিক ব্যবহারের ফলে সেচের পানির সাশ্রয় করে।

-আমন (ব্রি ধান৪৯)-বোরো (ব্রি ধান২৯)-পতিত শস্যক্রমের তুলনায় এ প্রযুক্তি শতকরা ৩২ ভাগ কম সেচের পানি ব্যবহার করে এবং শতকরা ৪৬ ভাগ

অধিক ধান-সমতুল্য ফলন দেয়।

-জ্বালানি তেল, সেচের খরচ সাশ্রয় করার মাধ্যমে প্রযুক্তিটি গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করে।

-শস্য আবর্তনের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

-ভূ-গর্ভস্থ পানির তলের অবনমন হ্রাস করে।

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ধানের ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম: ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ (Bacterial Blight)

রোগের কারণ: জ্যানথোমোনাস অরাইজি পিভি অরাইজি (Xanthomonas oryzae pv.oryzae) এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার : রোগটি আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই ব্যাপকভাবে দেখা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা (২৬-৩০ ডিগ্রি সে.), ৭০% এর ওপরে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, ঝড়ো-বৃষ্টি আবহাওয়া, রোগপ্রবণ জাত লাগানো, রোপণের সময় শিকড় অথবা গাছে ক্ষত সৃষ্টি, উচ্চ মাত্রায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ ইত্যাদির কারণে রোগের প্রকোপ বেশি হয়। পাতাপোড়া রোগ ধানের খড়, মাটি, পোকা, বাতাস ও সেচের পানির মাধ্যমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে পাতার অগ্রভাগ বা কিনারায় নীলাভ পানিচোষা দাগ দেখা যায়। দাগগুলো আস্তে আস্তে হালকা হলুদ রঙ ধারণ করে পাতার অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। শেষের দিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায় এবং ধূসর বা শুকনো খড়ের রঙ ধারণ করে। ফলে গাছটি প্রথমে নেতিয়ে পড়ে ও আস্তে আস্তে পুরো গাছটি মরে যায়। চারা ও কুশি অবস্থায় সাধারণত ক্রিসেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ রোগের ফলে গাছটি প্রথমে নেতিয়ে পড়ে ও আস্তে আস্তে পুরো গাছটি মরে যায়। অনেক সময় এ রোগের লক্ষণের অগ্রভাগ দিয়ে ব্যাকটিরিয়ার কোষগুলো বেরিয়ে আসে এবং কোষগুলো একত্রে মিলিত হয়ে ভোরের দিকে হলদে পুঁতির দানার মতো গুটিকা সৃষ্টি করে এবং এগুলো শুকিয়ে শক্ত হয়ে পাতার গায়ে লেগে থাকে। পরবর্তীকালে পাতার গায়ে লেগে থাকা জলকণা গুটিকাগুলোকে গলিয়ে ফেলে, ফলে এ রোগের জীবাণু অনায়াসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছের কা- ছিড়ে চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মতো তরল পদার্থ বের হয়। রাত ও দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি (৮-১০ ডিগ্রি সে.) হলে কচি পাতায় ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের লক্ষণটি প্রকাশ পায়।

রোগের প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করতে হবে। রোগাক্রান্ত জমির ধান কাটার পর নাড়া ও খড় পুড়িয়ে ফেলতে হবে। চারা উঠানোর সময় যেন শিকড় কম ছিড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ও ইউরিয়া সার ৩/৪ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু রোগ দেখার পর ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। ক্রিসেক আক্রান্ত জমি শুকিয়ে ৫-১০ দিন পর আবার পানি দিতে হবে। রোগ দেখার পর বিঘাপ্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ছিপছিপে পানিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে চিলিটেড জিংক স্প্রে করলে রোগের তীব্রতা কমে যায়।

কুমড়া জাতীয় ফসলের মোজাইক রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নামঃ

মিষ্টি কুমড়ার মোজাইক রোগ

লক্ষণঃ

- এ রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।
- জাব পোকা ও সাদা মাছি এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: এডমায়ার ১ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

মিষ্টি কুমড়ার ব্লোজম এন্ড রট রোগের দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নামঃ

মিষ্টি কুমড়ার ব্লোজম এন্ড রট রোগ

লক্ষণঃ

- আক্রান্ত গাছে প্রথমে কচি লাউয়ের নিচের দিকে পঁচন দেখা দেয়।
- ধীরে ধীরে পুরো ফলটিই পঁচে যায় ।
- সাধারণত আম্লীয় মাটিতে বা ক্যালসিয়ামের অভাব আছে এমন জমিতে এ রোগ দেখা যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- ক্ষেতে পরিমিত সেচ দেয়া ।
- গর্ত বা পিট প্রতি ৫০ থেকে ৮০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করা ।
- একই জমিতে বার বার একই সবজি আবাদ করবেন না।
- জমিতে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করলে পরপর আর তিন বছর প্রয়োগ করতে হবেনা।
- অম্লীয় বা লাল মাটির ক্ষেত্রে জমিতে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করা
- মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম সার ব্যবহার করা।

মাটি পরীক্ষার জন্য মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

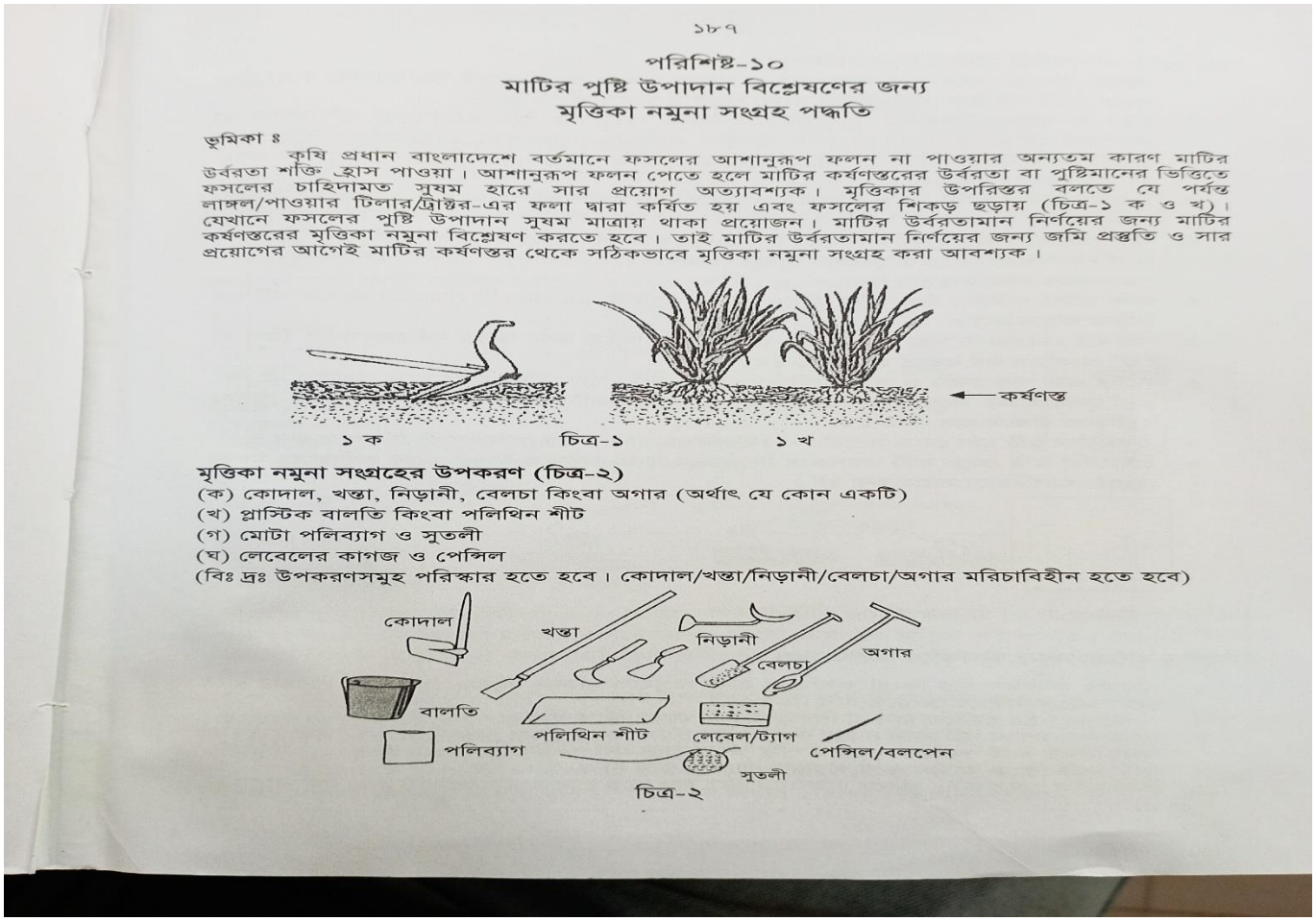

১৮৭

পরিশিষ্ট-১০

মাটির পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণের জন্য
মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে বর্তমানে ফসলের আশানুরূপ ফলন না পাওয়ার অন্যতম কারণ মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়া। আশানুরূপ ফলন পেতে হলে মাটির কর্ষণস্তরের উর্বরতা বা পুষ্টিমানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদামত সুষম হারে সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। মৃত্তিকার উপরিস্তর বলতে যে পর্যন্ত লাঙ্গল/পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টর-এর ফলা দ্বারা কর্ষিত হয় এবং ফসলের শিকড় ছড়ায় (চিত্র-১ ক ও খ)। যেখানে ফসলের পুষ্টি উপাদান সুষম মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। মাটির উর্বরতামান নির্ণয়ের জন্য মাটির কর্ষণস্তরের মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ করতে হবে। তাই মাটির উর্বরতামান নির্ণয়ের জন্য জমি প্রস্তুতি ও সার প্রয়োগের আগেই মাটির কর্ষণস্তর থেকে সঠিকভাবে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

১ ক চিত্র-১ ১ খ

মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহের উপকরণ (চিত্র-২)

(ক) কোদাল, খন্তা, নিড়ানী, বেলচা কিংবা অগার (অর্থাৎ যে কোন একটি)
(খ) প্লাস্টিক বালতি কিংবা পলিথিন শীট
(গ) মোটা পলিব্যাগ ও সুতলী
(ঘ) লেবেলের কাগজ ও পেন্সিল
(বিঃ দ্রঃ উপকরণসমূহ পরিষ্কার হতে হবে। কোদাল/খন্তা/নিড়ানী/বেলচা/অগার মরিচাবিহীন হতে হবে)

চিত্র-২

জমি থেকে কম্পোজিট মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ঃ

১. জমির সীমানা থেকে ২-৩ মিটার বা ৪-৬ হাত ভিতরে চিত্র অনুযায়ী সমান্তরালভাবে সমদূরত্ব বজায় রেখে ৯টি স্থান থেকে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

২. রাস্তা বা বাঁধের নিকটবর্তী স্থান/পরিত্যক্ত ইটের ভাটা/সদ্য সার প্রয়োগকৃত জমি/গোবর বা কম্পোস্ট কিংবা যে কোন আবর্জনা স্তুপকৃত জায়গা/ফসলের নাড়া পোড়ানোর জায়গা থেকে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, মাটির এরকম একটি মিশ্র নমুনা কেবল একটি খন্ড প্লট হতেই নিতে হবে।

৩. একাধিক প্লটের মাটির নমুনা পরীক্ষা করাতে হলে প্রতি খন্ড জমি হতে আলাদা কম্পোজিট নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

৪. মাটি সংগ্রহের আগে জমির এক স্থানে গর্ত করে কর্ষণ স্তরের গভীরতা দেখে নিতে হবে (চিত্র-১ ক ও খ)। সাধারণত রোপা ধানের জমিতে কর্ষণ স্তরের নিচে শক্ত 'কর্ষণ তল' থাকে, নমুনা সংগ্রহকালে কর্ষণ তল বাদ যাবে।

৫. কর্ষণ স্তরের গভীরতা জানার পর জমির আয়তন অনুযায়ী চিত্র অনুযায়ী (চিত্র-৩) জমিতে ৯টি স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

৬. পরিস্কার কোদাল বা খন্তা বা যে কোন খনন যন্ত্রের সাহায্যে কর্ষণ স্তরের গভীরতা পর্যন্ত (চিত্র-৪) 'V' আকৃতির গর্ত করতে হবে (চিত্র-৪খ)।

৭. গর্তের এক পাশ থেকে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ (৭-৮ সেমি) পুরু মাটির চাকা তুলে চাকাটির দুই পাশ এবং কর্ষণ তলের অংশ (যদি থাকে) কেটে বাদ দিয়ে চাকাটি পলিথিন শীটের উপর কিংবা প্লাস্টিক বালতিতে রাখতে হবে (চিত্র-৫)।

৮. একইভাবে ৯টি স্থান থেকে সংগৃহীত একই পরিমাণ মাটি বালতি/পলিথিন শীটে রাখতে হবে।

৯. চাষ দেয়া জমি থেকে মাটি এমনভাবে নিতে হবে যাতে ঢেলাযুক্ত কিংবা গুড়ো কর্ষণস্তরের সম্পূর্ন অংশই সমপরিমাণে সংগ্রহ করা হয়।

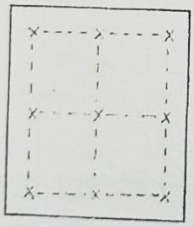

চিত্র-৩

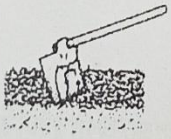

চিত্র-৪ ক

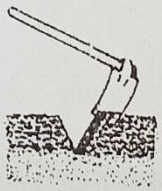

চিত্র-৪ খ

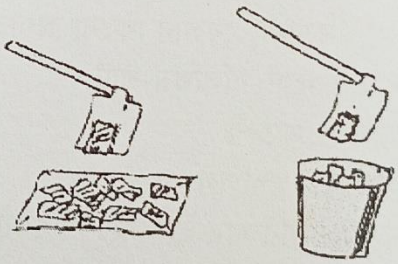

চিত্র-৫

সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনা ভালভাবে মিশ্রিতকরণ

১. পরিষ্কার পলিথিন শীট কিংবা বালতিতে রাখা সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার চাকাগুলো পরিষ্কার হাতে গুড়ো করে ভালভাবে মেশাতে হবে (চিত্র-৬)।

২. মেশানোর সময় মাটিতে ঘাস বা শিকড় থাকলে ফেলে দিতে হবে।

৩. ভালো করে মেশানো মাটি সমান ৪ ভাগ করে বিপরীত দু'কোণ থেকে দু'ভাগ ফেলে দিতে হবে। বাকী দু'ভাগ মাটি আবার মিশিয়ে একই পদ্ধতিতে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত কমিয়ে আনুন এবং পলিথিন ব্যাগে সংগ্রহ করুন।

৪. মাটি ভেজা কিংবা আর্দ্র থাকলে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে (চিত্র-৭)।

৫. ভেজা মাটির ক্ষেত্রে মাটির পরিমাণ এমনভাবে নিতে হবে যাতে শুকালে মাটি মোটামুটি ৫০০ গ্রাম থাকে।

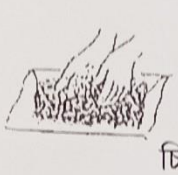

চিত্র-৬

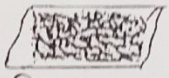

চিত্র-৭

মৃত্তিকা নমুনা ব্যাগে লেবেল বা ট্যাগ লাগান ঃ

১. ছক-এ দেয়া তথ্য সম্বলিত দুটি লেবেল বা ট্যাগ পূরণ করুন।
২. সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার ব্যাগটির মুখ সুতলি দিয়ে বন্ধ করে অন্য একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে নিন।
৩. পূরণকৃত একটি লেবেল বা ট্যাগ দুই পলিথিনের মাঝে এরূপভাবে রাখুন যাতে বাহির থেকে তথ্যগুলো পড়া যায়।
৪. এবার অন্য লেবেল বা ট্যাগটি দিয়ে চিত্র-৮ অনুযায়ী দ্বিতীয় পলিথিন ব্যাগটি সুতলী দিয়ে বেঁধে দিন।

ছক-এ দেয়া তথ্যসম্বলিত একটি লেবেল বা ট্যাগ (ছক-১) লাগিয়ে ঐ ব্যাগটির মুখ রশি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। পরে অন্য একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ বন্ধ করতে হবে (চিত্র -৮)।

লেভেল বা ট্যাগের নমুনা ছক

কৃষকের নাম	ঃ	মৃত্তিকা নমুনা নম্বর	ঃ	
পিতার নাম	ঃ	নমুনা সংগ্রহের তারিখ	ঃ	
মাতার নাম	ঃ	নমুনার গভীরতা	ঃ	..... সেন্টিমিটার
গ্রাম/মৌজা/দাগ নং	ঃ	স্বাভাবিক বর্ষায়		
ডাকঘর/ইউনিয়ন	ঃ	প্লাবনের গভীরতা	ঃ	..... সেন্টিমিটার
উপজেলা ও জেলা	ঃ	ভূমি শ্রেণি	ঃ	
বর্তমান ফসলের নাম (১) রবি	ঃ	মৃত্তিকা বুনট	ঃ	
(২) খরিফ-১	ঃ	মৃত্তিকা দল/সিরিজ	ঃ	
(৩) খরিফ-২	ঃ			
সম্ভাব্য ফসল বিন্যাস	ঃ	ভূমিরূপ	ঃ	ডাংগা/বিল/চালা/বাইদ/ উপত্যকা/পাহাড়
গবেষণা নমুনা কোড	ঃ			
তারিখ	ঃ			গ্রহীতার স্বাক্ষর

লেবেল/ট্যাগ

চিত্র-৮

মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ ও করণীয়

১. সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার পুষ্টি উপাদানের ভিত্তিতে সার সুপারিশ জানতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের জন্য নিকটস্থ এসআরডিআই-এর আঞ্চলিক/কেন্দ্রীয় গবেষণাগার কিংবা ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার-(এলাকায় উপস্থিত থাকলে) আপনি স্বয়ং কিংবা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা -এর মাধ্যমে ধার্যকৃত বিশ্লেষণ ব্যয়সহ নমুনা পৌঁছে দিন।
২. গবেষণাগারে পরীক্ষা শেষে ফলাফলসহ সার সুপারিশ জেনে সুপারিশ অনুযায়ী সার ব্যবহার করুণ।
৩. সরবরাহকৃত সার সুপারিশ কার্ডটি সংরক্ষণ করুণ।

যোগাযোগ ঃ

মাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য এসআরডিআই-এর বৃহত্তর জেলা/আঞ্চলিক/প্রধান কার্যালয়ের অথবা আঞ্চলিক/কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের সাথে যোগাযোগ করুণ।

এসডিজি ও কৃষি

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এজেন্ড' গৃহীত হয়। সারাবিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী একদশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (Leaving no one behind) নীতি অনুসরণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার। দারিদ্র্য নিরসনের পরই দ্বিতীয় এজেন্ডা হিসেবে এটি কর্মপরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। কেননা খাদ্য হলো আমাদের জীবনের নির্যাস এবং আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজের মূলভিত্তি। নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা চলমান করোনা মহামারীর সময়ে একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যের প্রয়োজন অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় পূরণের জন্য মানুষ যা খায় তাই তার খাদ্য। পুষ্টি উপাদান অনুযায়ী খাদ্যেরও শ্রেণিবিভাগ আছে। তবে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়তে হলে দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, পুষ্টিকর খাবারের পর্যাপ্ততা (availability) নিশ্চিতকরণ, দ্বিতীয়ত সব জনগোষ্ঠীর জন্য খাবার প্রাপ্তির সামর্থ্য (affordable) নিশ্চিতকরণ। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত্য সেন বলেছেন শুধুমাত্র খাদ্যের পর্যাপ্ততা কোনো দেশ বা জাতিকে ক্ষুধামুক্ত করতে পারে না যতক্ষণ না সব জনগোষ্ঠীর জন্য ওই খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিতে উৎপাদনের বৈচিত্র্যতা আনয়ন ও খাদ্য ব্যবস্থার সুষম বণ্টনে সকলকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। এই অনিশ্চিত সময়ে খাদ্যের টেকসই ব্যবস্থাপনাকে অটুট রেখে মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বব্যাপী কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। যদিও আমরা প্রত্যেকের চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি তবে আমাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়াটি ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে। পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবারের ভারসাম্যহীনতার অনেকগুলো কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পরিবেশের অবক্ষয়, কৃষিপরিবেশ বৈচিত্র্যের ক্ষতি, বর্জ্য এবং খাদ্য শৃঙ্খলকর্মীদের সুরক্ষার অভাব। করোনা পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ শুরু করার সাথে সাথে খাদ্য বন্টন ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতে টেকসই ভিত্তি তৈরির সুযোগ রয়েছে।

আমাদের অঙ্গীকার হোক বিশ্বব্যাপী সংহতি শক্তিশালী করার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় নিয়ে আসা, পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের যথাযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণেও কাজ করা। উন্নত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রণয়ন, ই-কমার্স ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ অর্জন করা সম্ভব।

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া